এডেলেইডে সাতদিন

প্রদীপ দেব

০৭

বেশ সকালেই ঘুম ভাঙলো। বক্তৃতার বিষয়ে একটু পড়াশুনা করে নিয়ে কনফারেনস সেন্টারে চলে গেলাম। বিশ মিনিটের বক্তৃতার জন্য আমি যে পরিমাণ লেখা পড়া করেছি তিনঘন্টা পরীক্ষার জন্যও এরকম ভাবে পড়তে হয়নি আগে। ইউনিয়ন হাউজের নিচতলায় পানি আনতে গিয়েই দেখা হয়ে গেলো ডক্টর মহানন্দা দাশগুপ্তার সাথে। তিনি বললেন,

- চলো, কোথাও বসে কথা বলি একটু।

গাছের নিচে বসলাম দু'জনে। ইংরেজির মতো বাংলাও চমৎকার বলেন তিনি। জানাগেলো তাঁর আদিপুরুষ বাংলাদেশী। তাঁর বাবার জন্মও বাংলাদেশের খুলনায়। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় দেশ ছেড়েছেন। ইন্ডিয়াতেও তাঁরা বাংলায় থাকেন না। তাঁদের বাড়ি রাজস্থানে। তিনি জন্মেছেনও রাজস্থানে। বাড়িতে বাবা মায়ের প্রেরণায় বাংলা বই পড়ে পড়ে বাংলা শিখেছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রিয় লেখক। এখানে আছেন সাড়ে আট বছর ধরে। অস্ট্রেলিয়ার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয়েছেন, কিন্তু নাগরিকত্ব নেননি। তিনি এখনো ভারতীয় নাগরিক। ভবিষ্যতে ভারতীয় পরমাণু শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করার ইচ্ছা আছে তাঁর। তাঁর ছোট ভাই থাকেন রাজস্থানে। ভবিষ্যতে ভাইয়ের সাথেই থাকবেন, এরকম প্ল্যান। বিয়ে করেন নি এখনো, ভবিষ্যতে কখনো করবেন বলেও মনে হয়না। এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্ট হিসেবে ইতোমধ্যেই তিনি যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। জুয়ান, তানিয়া সবার মুখে ডক্টর মহানন্দার প্রশংসা শুনতে খুব ভালো লেগেছে আমারো। আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন তিনি। ক্যানবেরা গেলে অবশ্যই যেন তাঁর ওখানে যাই বললেন বারবার। তাঁর ক্যানবেরা ফেরার ফ্লাইট আজ চারটায়। দুঃখ করে বললেন,

- আমার খুব খারাপ লাগছে প্রদীপ। তোমার টক্ শুনতে পেলাম না। আমি প্রোগ্রামটা আগে পেলে ফ্লাইটটা ক্যানসেল করতাম।

- না, ঠিক আছে। আমি আপনাকে আমার পেপার পাঠিয়ে দেবো।

কথা বলতে বলতে দু'জনে ফিজিক্স বিল্ডিং এ চলে এলাম। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সকালের অধিবেশনে আজ ডক্টর অঞ্জলি মুখার্জির বক্তৃতা আছে। ডক্টর মুখার্জিকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে। ডক্টর দাশগুপ্তা আমাকে কনুই দিয়ে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন,

- দেখো অঞ্জলির দিকে। বেচারা নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

অধিবেশনের তৃতীয় বক্তা অঞ্জলি। প্রথম বক্তার বক্তৃতা শেষ হবার আগেই অঞ্জলি বেরিয়ে গেলেন অডিটরিয়াম থেকে। হয়তো নার্ভাস ডায়রিয়া। আমার দাদার কথা মনে পড়লো। সে

মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি চর্চা করে। তার হোমিওপ্যাথিতে এই নার্ভাস হয়ে যাবার ওষুধ হলো সাইলেসিয়া। আমার হঠাৎ মনে হলো সাইলেসিয়ার মতো প্রয়োজনীয় বস্তু সাথে না এনে মস্ত ভুল করেছি।

ডক্টর অঞ্জলি মুখার্জি বক্তৃতা শুরু করার আগে স্লাইড প্রোজেক্টারে কপাল ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পাবার পরে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থীকে দেখেছি কপালে ঠেকাতে। এখানে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিজ্ঞানী ডক্টর অঞ্জলি মুখার্জিও এরকম কিছু করবেন ভাবিনি। এর নাম কি সংস্কার নাকি অন্ধবিশ্বাস? এরকম কোন বিশ্বাস একজন বিজ্ঞানীর কেন থাকবে?

আমার বক্তৃতা দুপুর দুটোর অধিবেশনে। বেলা দেড়টার দিকে ফিজিক্স বিল্ডিং এর পাশে খটমটে নামের বিশাল গাছের নিচে বাঁধানো চত্বরে বসে বক্তৃতার পয়েন্টগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছি। ভেবেছিলাম এখানে কেউ ডিস্টার্ব করবে না আমাকে। কিন্তু আমার ভাবনা কখনোই সঠিক হয়না। দুমিনিটের ভেতর ইয়াস্না হাজির। ধুপধাপ করে এসেই বললো,
- কোন চিন্তা করোনা প্রাডিব। তোমারটা দেখবে সুপার হয়েছে।
- ফাজলামি করবে না একদম। যাও এখান থেকে। আগামী তিন ঘন্টা আমি তোমার মুখ দেখতে চাইনা।
- বললাম তো আমারটার মতো বাজে হবেনা।
- তোমারটা বাজে হয়েছে যদি কেউ বলে তার মুন্ডু ছিঁড়ে নেবো আমি।
ইয়াস্না তার মোটামোটা দাঁত দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলো। সে যেতে না যেতেই ক্রেগ এসে হাজির। ক্রেগ এভারটন।
- প্রাডিব, কফি খাবে নাকি? প্রি-লেকচার কফি?
আর থাকা সম্ভব নয় এখানে। উঠে চলে যাচ্ছি, এসময় ট্রেসি ইমাজিন সহ আরো চার পাঁচজন। ট্রেসিকে বললাম,
- খেলা দেখতে গেলে না?
অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয়েছে এডেলেইড ওভালে। তাদের সবার সেখানে যাবার কথা। আমি ভেবেছিলাম আমার বক্তৃতার সময়ে বক্তারা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। এখন দেখি সবাই ঘুরঘুর করছে এখানে। ট্রেসি বললো,
- তোমার বক্তৃতার পরে যাবো খেলা দেখতে।
রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলো।

অডিটরিয়ামে ঢুকে বসে আছি চুপচাপ। এখনো পনেরো মিনিট বাকী অধিবেশন শুরুর। আমি অধিবেশনের চতুর্থ এবং শেষ বক্তা। সুতরাং এখনো যথেষ্ট সময় হাতে আছে। কেন্ আসবেন বলেছিলেন। এখনো তো এলেন না, ভাবতে না ভাবতেই হলের বাইরে কেনের গলা শোনা গেলো। হাসতে হাসতে হলে ঢুকলেন কেন্ আর প্রফেসর জর্জ ড্রাকুলিস। জর্জ ড্রাকুলিস অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের হেড। কেন্ এসে বসার সাথে সাথে অনেক প্রফেসর হ্যালো কেন্ বলে তাঁর চারপাশে ভিড় জমালো। বুঝলাম কেনের দাপটই আলাদা। কেন্ এই ইউনিভার্সিটি থেকে পি-এইচ-ডি করেছেন ছত্রিশ বছর আগে।

এসময় ডক্টর অ্যান্ড্রু সছবেরি এসে আমার পাশে বসতে বসতে বললেন,
- কেন্‌তো মনে হয় তোমার জন্যই এসেছেন এখানে।

বক্তৃতা শুরু হলো। হলভর্তি মানুষ। এতমানুষ আজকে হবার কথা নয়। তানিয়ার সাথে চোখাচোখি হতেই হাসলো সে। তার তো আজ চলে যাবার কথা ছিলো। তবে কি ফ্লাইট চেঞ্জ করেছে সে? অধিবেশনের সভাপতিত্ব করার কথা সিডনি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর লরেনস পিকের। কিন্তু বিকাল চারটার ফ্লাইটে তিনি চলে যাবেন বলে সভাপতির দায়িত্ব নিলেন সিডনি ইউনিভার্সিটির আরেক প্রফেসর রেজা হাশেমী নিজহাদ। আমার ঠিক আগেই জেসির বক্তৃতা। জেসি কার্লটন। নামটা মেয়েলী হলেও জেসি ছেলে। আমি কোন বক্তৃতায় কান দেবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ দেখছি অন্যের কথা কানের ভেতর ঢুকছে অন্যদিনের চেয়ে বেশি। মেলবোর্নে থাকতে কেন্ বলেছিলেন,
- বলার সময় মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাবে। আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ছি দেখলেই বুঝবে সব ঠিক আছে। আর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছি দেখলে বুঝতে হবে সামথিং রং।

তিনটা দশ মিনিটে আমার নাম ঘোষিত হবার সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম ডক্টর লরেনস পিক চলে যাবার জন্য ব্যাগ হাতে নিয়েও আবার বসে পড়লেন। ডায়াসে দাঁড়িয়ে আমার খুব একটা ভয় লাগছে না। কেনের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি এর মধ্যেই মাথা নাড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। পরবর্তী বিশ মিনিট ঝড়ের বেগে চলে গেলো। আমার জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক বক্তৃতা শেষ হলো। হাততালি দিতে এদেশের মানুষের কোন কৃপণতা নেই। প্রচুর হাততালি দিলো আমাকেও। তার মানে এই নয় যে আমার বক্তৃতা খুব ভালো হয়েছে। তবুও ভালো লাগলো খুব। ডক্টর লরেনসকে দেখলাম তখনো বসে আছেন। কেনের আশেপাশের প্রফেসররা কথা বলছেন তাঁর সাথে। এবার প্রশ্নোত্তরের পালা। প্রথম প্রশ্নটা আসলো সিডনি ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসরের কাছ থেকে। তিনি মেডিকেল সায়েন্সের রেডিওথেরাপিতে আমাদের মাইক্রোস্কোপিক মডেলটা কীভাবে ব্যবহার করা যাবে বিষয়ে একটা সূক্ষ্ম প্রশ্ন করলেন। আমি আমার মতো করে উত্তর দিলাম। প্রশ্নের উত্তর দেয়াটাকে একটু আগেও খুব ভয় পাচ্ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে কোন ব্যাপারই না। কেন্ বলেন গবেষণাটাতো আমি করছি, সুতরাং আমার গবেষণার বিষয়ে আমি ভালো জানবো অন্যদের চেয়ে। কেন্ আমার উত্তরের পরে আরো কিছু মন্তব্য যোগ করে দিলেন। সুপারভাইজারের দায়িত্বের মধ্যে এসব পড়ে কিনা আমি জানিনা। কিন্তু কেন্ আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করছেন তা অন্যান্য সুপারভাইজাররা তাঁদের স্টুডেন্টদের জন্য যে করেননা তা আমি আমার সাথের আরো কিছু পি-এইচ-ডি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে দেখেছি। কেন্ শুধুমাত্র আমার এই বক্তৃতাটির জন্য মেলবোর্ন থেকে উড়ে এসেছেন আজ সকালে। দ্বিতীয় প্রশ্নটা করলো রাসেল। সেই অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যবতী রাসেল বাট। আমিতো ভেবেছিলাম রাসেল শুধু সেলাই কাজই করে এখানে বসে। কিন্তু তার প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারছি সে বক্তৃতার প্রত্যেকটি শব্দ মনযোগ দিয়ে শোনে। প্রশ্ন করার জন্য আরো অনেকে হাত তুললেও সভাপতি আর কাউকে সুযোগ না দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন। মনে হলো একটা বিরাট ভার নেমে গেলো আমার ঘাড় থেকে।

মাথা নিচু করে স্লাইডগুলো গুছিয়ে নিয়ে সিটের কাছে আসতেই আমাকে অবাক করে দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রফেসর জেফ টেইলর।
- কনগ্রাচুলেশান্স। ইট ওয়াজ এ ভেরী গুড টক্।
আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। জেফ টেইলর পৃথিবী বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্ট। অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ কাউনসিল তাঁর প্রজেক্টে নয় মিলিয়ন ডলারের অনুমোদন দিয়েছে এবছর। আমাদের ডিপার্টমেন্টে জেফ টেইলরের আলাদা ক্ষমতা। তিনি আমার কাজের অগ্রগতি জানতে চাইলেন। আমার খুব ভালো লাগছিলো এরকম বড় একজন মানুষের সাথে কথা বলতে। কেন্ তখন অনেকের সাথে কথা বলছেন হলের অন্যপ্রান্তে। ম্যাট এসে হ্যান্ডশেক করলো আমার সাথে। র‍্যাছেল এসে জড়িয়ে ধরে গালের সাথে গাল লাগিয়ে দিলো। এটা হলো ইংরেজি কায়দা। ছেলেদের সাথে ছেলেরা হাত মিলাবে আর মেয়েরা গাল মিলাবে। ক্রেগ এসে বললো,
- ভেরী গুড টক্ প্রাডিব। তুমি একটা সফ্টওয়ার তৈরি করে বাজারে ছেড়ে দাও, রেডিওথেরাপিস্টরা লুফে নেবে।
অভিনন্দনের ঘনঘটায় আমার লজ্জা লাগছে। আমার এই সব বন্ধুদের টকের পরে আমি এভাবে অভিনন্দন জানাইনি তাদের। এবার কেন্ এগিয়ে এলেন আমার দিকে। পিঠে হাত দিয়ে বললেন,
- ওয়েলডান মাই বয়।
কেনের মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে খুব ভালো লাগলো আমার। কেন্ জানতে চাইলেন আমার কোথাও কোন ধরণের অসুবিধা হয়েছে কিনা, থাকা খাওয়ার, টাকা পয়সার। একজন বাবা যেভাবে সন্তানের সুযোগ সুবিধার দিকে চোখ রাখেন কেন্ও আমার ব্যাপারে সেরকম। বললেন কাল পরশু খেলা দেখতে যেতে। তারপর চলে গেলেন তিনি।

হল থেকে বেরুবার মুখে দেখি তানিয়া দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে তার মস্ত ব্যাগ আর মুখে হাসি। আমার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েই দৌড়ে চলে গেলো সে। এখন ফ্লাইটটা মিস না করলেই হলো। আমি এখন মোটামুটি ফ্রি হয়ে গেছি মনে হচ্ছে। আর একটি মাত্র অধিবেশনের পরে শেষ হয়ে গেলো সপ্তাহ ব্যাপী অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স কনফারেনস।

কনফারেনস শেষে মেলবোর্ন গ্রুপের কয়েকজনের সাথে হাঁটতে হাঁটতে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে চলে এলাম। গ্রোট স্ট্রিট আর কিং উইলিয়াম স্ট্রিটের কোণায় চায়না টাউন। পৃথিবীর সব বড় বড় শহরের মতো এখানেও আছে চায়না টাউন। চায়না টাউনের ইন্টারন্যাশনাল ফুড কোর্টের যথেষ্ট নামডাক শুনেছি। চীন, জাপান, হংকং, মেক্সিকো, ইতালি সব দেশের খাবারের বিচিত্র সমাবেশ এখানে। কিন্তু বিক্রেতাদের বেশির ভাগই চায়নিজ। এক জায়গায় ভাত আর মাছ খেলাম। সবাই এক সাথে এলেও যে যার মতো পছন্দের খাবার কিনে নিয়ে একজায়গায় বসে গেলাম। বিরাট জায়গা জুড়ে চেয়ার টেবিল পাতা আছে। মাছ রান্নাটা দারুণ হয়েছে। কী মাছ সেটা বিবেচ্য নয় এখানে, খাদ্যটা যে মাছ তাতেই আমি খুশি। বেশ তৃপ্তি করে খেলাম। খাবার পরে ইমাজিনের বীয়ারের পিপাসা পেয়ে গেলো। ''বার''এ না ঢুকতে পারলে যেন তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তাই তাদের সাথে একটা বারে ঢুকে পড়লাম। আমি ছাড়া বাকি সকলেই অস্ট্রেলিয়ান বীয়ার নিয়ে বসে পড়লো একটা বড় টেবিল দখল করে। আমি একগ্লাস

কোকাকোলা নিলাম। গ্লাসের তিনচতুর্থাংশ বরফের কুচি দ্বারা ভর্তি করে বাকীটাতে কিছু কোক ঢেলে দিলো, এর নাম কোকাকোলা। এটারই দাম অরিজিনাল কোকাকোলার দামের মাত্র দ্বিগুণ।

কয়েক বোতল বীয়ার পেটে ঢুকলে যা হয়। এদের হঠাৎ আন্তর্জাতিক সংগীত শোনার ইচ্ছা করতে লাগলো। ট্রেসি বললো,
- ইন্টারন্যাশনাল খাবারের পরে ইন্টারন্যাশনাল সংগ্স।
ইয়াস্না এবছরের শুরুতে জাপান ঘুরে এসেছে। সে একটা জাপানী গান গাইলো। আমার মনে হলো সে গানে ভেজাল দিয়েছে ইচ্ছেমতো। ট্রেসি ফরাসী জানে। সেটা জানানোর সুযোগ সে ছাড়লো না। জন অরিজিনাল চায়নিজ। তার মেয়ে ভালো গান গায় সেটা জানতাম, কিন্তু জনও যে এত ভালো গায় জানা ছিলো না। চীনা ভাষার কিছুই বুঝতে না পারলেও জনের গলায় যে সুর আছে তাতে কোন ভুল নেই। আমি আত্মগোপণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেও পার পেলাম না। পুরো বারে আমার মতো কালো চামড়ার আর কেউ নেই। সবাই চেঁচিয়ে চেপে ধরলো আমাকে, গান গাইতেই হবে। আমার গলায় যে কোন সুর নেই তা আমাকে যারা চেনে তাদের সবাই জানে। কিন্তু এরা তো আর বাংলা গান শোনেনি কখনো। কী গাইবো বুঝতেও পারছি না। বিপদের সময় কোন গানের কথাই মনে আসছে না। শেষ পর্যন্ত ‘‘ভালোবাসি ভালোবাসি, এই সুরে, কাছে দূরে - - ’’ করে কোনরকমে থামলাম। রবীন্দ্রসংগীত এরা কেউ আগে শোনেনি বলে প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু বিপদের ওপর বিপদ, আমাদের বিরল প্রজাতির মেয়ে [তার থুতনিতে সামান্য দাড়ি আছে] ইমাজিন জানতে চাইলো গানের ইংরেজি অনুবাদ। বললাম,
- আই লাভ ইউ।
এই একটি বাক্যই বিস্ফোরণের জন্য যথেষ্ট। সবাই উন্মাদের মতো হাসতে লাগলো।

০০

ভোরের এডেলেইড দেখার সুযোগ আবার এলো আজ। এবারে পুরোপুরি পর্যটক। আমার পিঠে ব্যাগ, কাঁধে ব্যাগ আর হাতেও ব্যাগ। সাথে এনেছিলাম দুটো, কনফারেনসের ব্যাগ সহ এখন তিনটে হয়েছে। আজ কোন ট্যাক্সি নয়, হেঁটেই রওনা দিয়েছি বাস স্টেশনের দিকে। মনে পড়লো আজ ষোলই ডিসেম্বর। ঊনত্রিশ বছর আগে আজকের দিনে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ জিতে ঘরে ফিরেছিলো। আমি ফিরছি এক শহর থেকে অন্য শহরে। কোনটাই আমার ঘর নয়। হাঁটতে হাঁটতে গ্রেহাউন্ড পাইওনিয়ার বাস টার্মিনালে পৌঁছে গেলাম। বোর্ডিং পাস নিলাম। কর্তৃপক্ষ লাগেজের দায়িত্ব নিচ্ছে না। লাগেজ নিজের দায়িত্বেই বাসের লাগেজ কেবিনে তুলে দিতে হবে। এই ব্যবস্থাটা মোটেও পছন্দ হলো না আমার। পৌনে আটটাতেও বাসের দেখা নেই। সকাল আটটায় বাস ছাড়ার কথা। আটটায় একটা মেলবোর্নের বাস এলো। এই বাসের ড্রাইভারটা বেশ মজার। সুর করে কবিতা পড়ার মতো করে কথা বলে। আমার ব্যাগ দু'টোতে মেলবোর্নের ট্যাগ দেখে লাগেজ কেবিনে তুলে নিলো। যাত্রীদের মধ্যে অনেকের টিকেট দেখছি অন্যরকম। তবে কি দুটো আলাদা বাস যাচ্ছে মেলবোর্নে? যা ভেবেছি তাই। আমাদের বাস হলো পরেরটা। অথচ আমরা সবাই যার যার লাগেজ তুলে দিয়েছি এই বাসে। আবার ব্যাগের পেট খোলা হলো। ড্রাইভারের কাছে ব্যাগ চাইলে বললো,

- কেন চিন্তা করছো? এই বাসও একই জায়গায় যাবে। তোমার ব্যাগ ওখানে টার্মিনালে রেখে দেবো। তোমার বাস যখন যাবে তখন সেখান থেকে তোমার ব্যাগ নিয়ে নিও।

হয়তো ড্রাইভারের কথা ঠিক। কেউ ধরেও দেখবে না আমার ব্যাগ। কিন্তু বাবারে, আমি বাঙালি। আমার ব্যাগ অন্ত প্রাণ। ব্যাগ নিয়ে কোন রকমের বেগ পেতে আমি রাজি নই। আমার মতো অনেকেই যার যার ব্যাগ ফেরত নিয়ে নিলো। ড্রাইভারটা সামনে যা পেয়েছে সবই তুলে নিয়েছে তার বাসে। দেখা গেলো সিডনির ব্যাগও উঠে গেছে সেখানে।

অবশেষে আমাদের আটটার বাস এলো সাড়ে আটটায়। অস্ট্রেলিয়ার সময়ানুবর্তিতায় বিরাট এক কালো দাগ টেনে দিয়ে বাস ছাড়লো পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরীতে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরী ক্ষমার অযোগ্য। তবুও ড্রাইভার বারবার ক্ষমা চাইবার পরে মনে মনে ক্ষমা করে দিলাম। [ক্ষমা না করলেই যেন কী একটা হয়ে যেতো আর কি!]

আস্তে আস্তে পেছনে সরে যাচ্ছে এডেলেইড। পাহাড়ি পথের ওপর থেকে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম এডেলেইডের পথ - যে পথ ক'দিনের জন্য হলেও বেঁধে দিয়েছিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি।